OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 151 - 162
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের দ্বন্দ্ব : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনুয়া আচেবের ছোটগল্পের এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাদিয়া আফরিন
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ [ইউল্যাব], ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID: sadia.afrin@ulab.edu.bd
0009-0007-4320-773X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Tradition, modernity, cultural identity, postcoloniality, hybridity, colonization of the mind, Third Space.

Abstract

Tarashankar Bandyopadhyay and Chinua Achebe stand as two of the most significant literary voices in Bangla and African literature, each offering a profound representation of the cultural, economic, and political transformations of their respective societies. Writing from within moments of intense historical transition, both authors foreground the tension between tradition and modernity as a central dimension of human experience in postcolonial contexts. In Tarashankar's Jalsaghar, the decline of the zamindari order in rural Bengal is portrayed alongside the emergence of capitalist modernity; similarly, in Achebe's Dead Men's Path and Marriage Is a Private Affair, the confrontation between Western mod ernity and indigenous cultural values unfolds within the colonial African context, producing psychological conflict, social division, and cultural dislocation.

This article adopts a comparative and interpretive framework to explore the dynamics of social transformation, mental colonization, and cultural in-betweenness in the selected short stories of the two writers. Drawing on Homi K. Bhabha's concept of the "Third Space" and Ngũgĩ wa Thiong'o's notion of the "colonization of the mind," the study argues that both Tarashankar's feudal Bengali milieu and Achebe's colonially disrupted African society are shaped by profound internal crises, in which the encounter between inherited traditions and modern forces generates hybrid and unstable forms of cultural identity. Through nuanced narrative strategies and deep historical awareness, both authors represent the changing realities of their societies with remarkable human sympathy and critical insight. As a result, their short stories transcend specific national and ethnic locations to articulate a broader and more universal crisis of identity in times of social change. The analysis ultimately demonstrates that, for both writers, the conflict between tradition and modernity is not merely a social or cultural issue, but fundamentally a crisis of human identity.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

১

আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব মানবসভ্যতার বিকাশযাত্রায় এক চিরন্তন অনুষঙ্গ। শিল্প ও সাহিত্যে এই দ্বন্দ্ব কেবল বিষয় নয়— এটি মানবচেতনার পরিবর্তনের ভাষ্য। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮–১৯৭১) এবং আফ্রিকান সাহিত্যে চিনুয়া আচেবে (১৯৩০–২০১৩) এই দ্বন্দ্বের দুই ভিন্ন ভূগোল ও সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত। উভয়ের সাহিত্যই সমাজের রূপান্তরের ইতিহাসকে ধারণ করে, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘাত ব্যক্তি, পরিবার ও সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ সঙ্কট হিসেবে প্রকাশিত হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ব্রিটিশ ভারতের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সমাজে, যেখানে কৃষিনির্ভর জীবনধারা ধীরে ধীরে বণিকতন্ত্র ও নগরপুঁজিবাদের কাছে পরাজিত হচ্ছিল। তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনালগ্ন থেকেই এই সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত তাঁর গল্পে অনুরণিত হয়।

> "সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি ... আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।"[১]

এই আত্মজৈবনিক মন্তব্যেই বোঝা যায় যে, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব কেবল তাঁর সাহিত্যিক কল্পনার অংশ নয়, বরং এটি ছিল তাঁর বাস্তবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। বিশেষত 'জলসাঘর' গল্পে জমিদারতন্ত্রের পতন ও নবপুঁজিবাদী শ্রেণির উত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি এমন এক সমাজের চিত্র এঁকেছেন, যেখানে অতীতের ঐশ্বর্য ও বর্তমানের বাস্তবতার সংঘাতে ব্যক্তির আত্মপরিচয় ভেঙে যায়। বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রের মাধ্যমে তিনি এক প্রজন্মের সাংস্কৃতিক শূন্যতা ও মানসিক সংকট তুলে ধরেছেন, যা কেবল অর্থনৈতিক নয় বরং এক গভীর মানবিক ভাঙনের প্রতীক।

অন্যদিকে, চিনুয়া আচেবে ঔপনিবেশিক নাইজেরিয়ার সন্তান। তাঁর সাহিত্য আফ্রিকার ইতিহাসে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের প্রভাব ও প্রতিরোধের দলিল। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, খ্রিস্টান ধর্মমত এবং আফ্রিকার স্থানীয় ঐতিহ্যের সংঘর্ষ আচেবের গল্পে এক অবিরাম টানাপোড়েন হিসেবে উপস্থিত। আচেবে বলেছেন—

> "মনে পড়ে আমি যখন বেড়ে উঠছিলাম তখন আমাদের মাঝে অন্যকে খাটো করে দেখার প্রবণতা কাজ করত। আমাদের ডাকা হত 'গীর্জার মানুষ' কিংবা 'ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট' এসব নামে। একমাত্র সত্য ধর্মের অনুসারী হিসেবে গর্বে বুক ফুলিয়ে অন্যদের আমরা ডাকতাম 'পৌত্তলিক' কিংবা 'কিছু-নাই'র মানুষ' হিসেবে। ... আমাদের সময়টা ছিল সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের। এখনও তাই। ... সংস্কৃতির এই মোড় পরিবর্তনের চৌরাস্তায় একপথে আমরা দিবারাত্রি স্তোত্রগান গাইতাম এবং বাইবেল পড়তাম।"[২]

তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে আফ্রিকানদের আত্মপরিচয় ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি ঔপনিবেশিক ভাবনার বিপক্ষে নিজস্ব শক্তিশালী প্রতিবাদ গড়েছেন। তাঁর সাহিত্য নিঃসন্দেহে আফ্রিকান এবং বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের গভীর ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। বিশেষত, 'Dead Men's Path'-এ যেমন স্কুলপ্রধান মাইকেল অবি পশ্চিমা আধুনিকতার যুক্তিবাদী বিশ্বাসে নিজস্ব সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, তেমনি 'Marriage is a Private Affair'-এ ভালোবাসা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রত্যাখ্যান সামাজিক বিভাজনের জন্ম দেয়। তাঁর সাহিত্য উপনিবেশোত্তর মানুষের মনোজগতে সঞ্চিত 'mind colonization'-এর এক গভীর বিশ্লেষণ।

দুই লেখকের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। উভয়েই মানুষ ও সমাজের রূপান্তরের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করেছেন। তারাশঙ্করের গল্পে যেমন পুঁজিবাদী সমাজের উত্থান ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে ক্ষয় করে দেয়, তেমনি আচেবের গল্পে পাশ্চাত্য আধুনিকতার আগ্রাসন আদিবাসী সংস্কৃতির জৈব ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন করে। এই অভিজ্ঞতা উভয় সাহিত্যিকের কাছে মানবিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এক শিল্পিত প্রকাশ হয়ে উঠেছে।

বাংলা ও আফ্রিকান সাহিত্যে উভয় লেখককে নিয়ে আলাদা গবেষণা বহু হয়েছে কিন্তু তাঁদের ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে তুলনামূলক আলোচনায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ এখনো পর্যাপ্ত নয়। এই গবেষণায় তাই উভয়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গল্পসমূহকে থিম্যাটিক বা বিষয়ভিত্তিক তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হবে; যেখানে জমিদারি পতন, শ্রেণি সংঘাত, উপনিবেশিক মানসিক দাসত্ব এবং সাংস্কৃতিক প্রতিরোধকে এক সমান্তরাল বিশ্লেষণ কাঠামোয় দেখা হবে। ফলে এই গবেষণা কেবল দুই সাহিত্যিকের ভাবধারার তুলনা নয়, বরং বাংলা ও আফ্রিকান সমাজের সাংস্কৃতিক মনোবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটি সমন্বিত পাঠও বটে।

২

'জলসাঘর' (১৩৪১) গল্পটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। যাকে তিনি নিজেই বলেছেন—

> "জলসাঘরই আমাকে পরিচিত করে দিয়েছিল পাঠক-সমাজের মধ্যে।"[৩]

এই গল্পগ্রন্থেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে আধুনিকতার আগ্রাসী শক্তি ও ঐতিহ্যের ভাঙনের দ্বন্দ্ব। এই গল্পে তিনি মূলত নিজের কথাই বলেছেন, যার ফলে এর সুর এত প্রাণবন্ত ও গভীরভাবে পাঠকের মনে বাসা বেঁধেছে। গল্পে পুঁজিবাদী ধনিক শ্রেণি ও সামন্ত শ্রেণির দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নতুন সময় বা পুঁজিবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পুরাতন কালের শৌর্য-বীর্য যেমন ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু মানসিক দুর্বলতাও হারায়নি। মহিম গাঙ্গুলি ও বিশ্বম্ভর রায়ের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। নতুন ও পুরাতনের সংঘাতে পুরাতনের পরাজয়ের প্রতি তারাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাসই এ গল্পের মর্মস্থল। লেখকের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন চরিত্র ও বিষয় থাকলেও ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের প্রতি তার মমত্ববোধ লুকিয়ে থাকে। তাই 'জলসাঘর'-এ জমিদারদের ম্লান ঐশ্বর্য স্পষ্ট। গল্পে পতনোন্মুখ সামন্ত সমাজের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ানো পুঁজিবাদী, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই লেখক বিশ্বম্ভর রায়ের অন্তর্মুখী মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, যিনি ভোর তিনটায় ছাদে পায়চারি করছেন। প্রাকৃতিক পরিবেশে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশের উজ্জ্বল শুকতারা ও দূরের গাঙুলী বাড়ির বিজলি বাতির জ্বলন একটি প্রতীকেরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশ্বম্ভরের ডুবন্ত অবস্থা এবং পুঁজিবাদের উত্থানকে নির্দেশ করে। গল্পে বর্ণিত, -

> "ঢং-ঢং-ঢং করিয়া গাঙুলীবাবুদের ছাদে তিনটার ঘড়ি এতক্ষণে পেটা হইল। পূর্বে দুইশত বৎসর ধরিয়া এ অঞ্চলে ঘড়ি বাজিত রায়বাবুদের বাড়িতে, এখন আর বাজে না।"[৪]
>
> "ঘড়ির ঘণ্টা বেজে ওঠা নতুন সময়ের আগমন ও পুরাতন দিনের শেষের সংকেত। রায় বংশের প্রথম চার পুরুষের মধ্যে শৌর্য ও দম্ভ ছিল, কিন্তু পরবর্তী তিন পুরুষের মধ্যে তা ক্রমশ শূন্যতায় রূপ নিয়েছে। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায়ের সামনে কেবল অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, কারণ 'তিন পুরুষ ধরিয়া রায়েরা করিয়াছিলেন সঞ্চয়, চতুর্থ করিয়াছিলেন রাজত্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তমের আমলে রায়বাড়ির লক্ষ্মী ঋণসমুদ্রে তলিয়ে গেল।"[৫]

নব্য বণিক সভ্যতার প্রতিনিধি মহিম গাঙুলী পুরাতন জমিদার সমাজের পতনের প্রতীক হিসেবে গল্পে উপস্থিত। তার ঝকঝকে মোটরগাড়ি ও আধুনিক জীবনযাত্রার চিত্র 'পুঁজিবাদের উত্থান' হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বম্ভর রায়ের ভাঙা দেউরি ম্রিয়মাণ সামন্তবাদের প্রতীক। সামন্তবাদের পতনের প্রধান কারণ হিসেবে লেখক সামন্ত শ্রেণির প্রভুদের লাগামহীন ভোগবিলাসিতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'জলসাঘর' তাদের বিলাসিতার প্রতীক। রাবণেশ্বর রায় জলসাঘর তৈরি করেছিলেন, যার প্রথম মজলিসের দিনে তার স্ত্রী-পুত্র মারা গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারকেশ্বর বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন অঢেল সম্পদ।

> "তিনি একরাত্রে এক আমীর বন্ধুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পাঁচশত মোহর বকশিশ দিয়েছেন।"[৬]

বিশ্বম্ভর রায়ের রক্তে প্রবাহিত এই সামন্ততান্ত্রিক প্রবাহ তার যৌবন থেকে বয়সের শেষদিন পর্যন্ত ভোগবিলাসিতার ছাপ রেখেছে। অতীতের মোহ, পুরোনো খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার বাসনাই তাঁর পতনের কারণ। মহিম গাঙুলীর সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা তাঁকে সর্বস্বান্ত করে। বকশিস দেওয়ার জন্য শেষ গয়না বিক্রি করতে হয়েছে, আর মহিম টাকার তোড়া নামিয়ে দেয়।

> "মোহ কেবল বিশ্বম্ভরের নয়, সাত রায়ের ঘরে জমে আছে।"[৭]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গল্পের শেষে বিশ্বম্ভর রায় উপলব্ধি করেন যে অতীতের বিলাসিতা আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। 'বাতি নিবিয়ে দে, জলসাঘরের দরজা বন্ধ কর'[৮] - এই চূড়ান্ত সংকেত তাঁর আত্মগৌরবের হাহাকারকে প্রতিফলিত করে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য যর্থার্থই বলেছেন—

> "রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা অথবা প্রথম কয়েক পুরুষের মধ্যে এই অসহায়ত্ব দেখা যায় নি, কিন্তু বংশের শেষ পুরুষ বিশ্বম্ভরের সামনে কেবল অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ। মহিম গাঙ্গুলীর কাছে তাঁর পরাজয় কেবল ব্যক্তিগত নয়, তা ঐতিহাসিক সত্য। গ্রামে যে নতুন বণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হচ্ছিল তাঁদের সঙ্গে পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই সামন্ততন্ত্রকে এই অসম-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল। এই অসম-সংগ্রাম তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে কোন কল্পিত ব্যাপার ছিল না। গ্রামীণ সমাজে নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব ও তাদের সঙ্গে জমিদারের নিয়মিত বিরোধ তাঁর চোখেই দেখা।"[৯]

অন্যদিকে চিনুয়া আচেবের *মৃত মানুষদের পথ* (Dead Men's Path) গল্পে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যকার সামাজিক দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। এই গল্পটি মূলত খ্রিস্টধর্ম ও আফ্রিকার প্রাচীন বিশ্বাসের সংঘাতকে বিশ্লেষণ করে, পাশাপাশি উপনিবেশবাদের প্রভাব আফ্রিকান জনজীবনে কীভাবে পরিবর্তন এনেছে তা অনুসন্ধান করে। গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয় ১৯৪৯ সালে, নডিউম সেন্ট্রাল স্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক মাইকেল অবির চারপাশে। মাইকেল নিজেকে উচ্চশিক্ষিত ও আধুনিক ধারার ব্যক্তি হিসেবে দেখে, আর সে কারণে স্থানীয় বয়স্ক ও স্বল্পশিক্ষিত লোকদের সংকীর্ণমনা মনে করেন।

> "বেশ ভালো মাধ্যমিক শিক্ষা থাকার সুবাদে অফিসিয়াল রেকর্ডে তিনি 'গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক' হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন, তাই মিশন ফিল্ডের অন্য প্রধান শিক্ষকদের থেকে আলাদা। বয়স্ক ও স্বল্পশিক্ষিতদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করতেন।"[১০]

মাইকেলের লক্ষ্য ছিল স্কুলকে আধুনিকীকরণ এবং সৌন্দর্যায়ন, যা তিনি স্ত্রী ন্যান্সির সহযোগিতায় আগ্রহের সঙ্গে সম্পন্ন করেন। পুরনো ধারণা ও প্রবীণদের চিন্তাধারাকে তিনি অপছন্দ করতেন, আর তার স্ত্রীও তার আধুনিক চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হন।

> "দুই বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর 'আধুনিক পদ্ধতি'-এর প্রতি অনুরাগ তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। ন্যান্সি নিজেকে তরুণ শিক্ষকের গুণমুগ্ধ স্ত্রী, স্কুলের রাণী হিসেবে ভাবতে শুরু করেন, অন্য শিক্ষকদের স্ত্রীরা তাকে দেখে হিংসায় জ্বলে উঠত।"[১১]

মাইকেল স্কুলের উন্নত শিক্ষাদান এবং চত্বরকে সুন্দর করার ওপর মনোযোগ দেন, আর ন্যান্সি কর্মীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাগানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। "ন্যান্সির স্বপ্নের বাগানে বৃষ্টি নামে, ফুল ফুটে গাছগুলোতে।"[১২] তবে স্কুল চত্বরের মধ্য দিয়ে একটি পুরনো পথ ছিল, যা গ্রামের মানুষ চলাচলের জন্য ব্যবহার করত। পথটি গ্রামের উপাসনালয় ও কবরস্থানকে সংযুক্ত করত। মাইকেল এই পথটি বন্ধ করে দেন, কারণ তিনি এটি পুরনো ও অপ্রাসঙ্গিক বিশ্বাস হিসেবে দেখেন। কয়েকদিন পর গ্রামের পাদ্রি (ওঝা) প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ও ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলেন। তিনি জানান—

> "এই পথটি তোমার জন্মের আগেও ছিল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পথ দিয়েই বিদায় নেন, নবজাতকরা পৃথিবীতে প্রবেশ করে।"[১৩]

মাইকেল এই ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার পক্ষপাতী। মাইকেল ও ওঝার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সংঘাতকে প্রকাশ করে। ওঝা বলেন—

> "তুমি যদি পথটা খুলে দাও তাহলে আর আমাদের ঝগড়া হবে না। যেমন বাজপাখি বসতে দেয়, ঈগলকেও।"[১৪]

এই উক্তিতে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের শেষে এক তরুণী-মা সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়, যাকে গ্রামবাসীরা পথ বন্ধ করার কারণে পূর্বপুরুষদের ক্রোধের প্রতিফলন মনে করে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা স্কুল আক্রমণ করে, ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "পরদিন সকালে অবি জেগে উঠেন, স্কুল চত্বরের গাছপালা ভেঙে ফেলা, ফুলগুলো পিষে নষ্ট এবং একটি ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"[১৪]

অবির উপর তার উর্ধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা বলেন—

> "স্কুল এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে জাতিগত সংঘাতের একটি অংশ নতুন প্রধান শিক্ষকের ভুল দিক থেকে জন্ম নিয়েছে।"[১৫]

গল্পে 'মৃত মানুষের পথ' অতীতের সঙ্গে সংযোগের প্রতীক। এটি সেই পথ, যার মাধ্যমে বিশ্বাস অনুযায়ী নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আসে। পথটি বন্ধ করাই অতীত ও ভবিষ্যতকে অস্বীকার করার অর্থ বহন করে।

উক্ত দুটি গল্পে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব ও সমাজরূপান্তরের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আধুনিকতার প্রবাহ যখন সমাজে প্রবেশ করে, তখন প্রথম অভিঘাত পড়ে ঐতিহ্য ও শ্রেণি-ভিত্তিক মূল্যবোধে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনুয়া আচেবের গল্পগুলো সেই সংঘর্ষের শিল্পিত দলিল। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় এবং 'Dead Men's Path'-এর মাইকেল অবি চরিত্র উভয়েই আধুনিকতার স্রোতে অবস্থান করেও বিপরীত মানসিকতার প্রতীক।

বিশ্বম্ভর রায় প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ঐশ্বর্যের প্রতিনিধি, যিনি অতীতের গৌরব আঁকড়ে ধরে বর্তমানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন। তাঁর জলসাঘর একরকম সাংস্কৃতিক স্মৃতির কবরস্থান, যেখানে অতীতের ঐশ্বর্য ও সংগীত প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু নতুন সময় সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। অপরদিকে, মাইকেল অবি নিজেকে 'আধুনিকতার দূত' মনে করেন, যিনি পশ্চিমা যুক্তিবাদে আস্থাশীল এবং নিজের সংস্কৃতির ধর্মীয় বিশ্বাসকে অজ্ঞতা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। এই দুই চরিত্রের মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, উভয়েই সময়ের পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ এবং ফলত একপ্রকার সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার শিকার। বিশ্বম্ভর অতীতের মোহে বন্দি, অবি ভবিষ্যতের মোহে অন্ধ; কিন্তু দুজনের পতনের কারণ একই; আত্ম-অহংকার ও ঐতিহ্য-বিমুখতা। গল্প দুটির পরিণতিতে দেখা যায়, একজনের আত্মবিনাশ, অন্যজনের সামাজিক বিপর্যয়।

হোমি কে. ভাভা তাঁর 'Third Space' তত্ত্বে বলেছেন, পুরাতন ও নতুনের মধ্যবর্তী পরিসরেই সৃষ্টি হয় এক সাংস্কৃতিক অস্পষ্টতা, যেখানে পরিচয় স্থির থাকে না, বরং পুনর্নির্মিত হয়। এই প্রসঙ্গে হোমি কে. ভাভা যেমন বলেছেন—

> "Culture is not a static essence, but a site of negotiation."[১৬]

এই 'Negotiation'-এর ক্ষেত্রেই দাঁড়িয়ে তারাশঙ্কর ও আচেবে তাঁদের সাহিত্যিক দর্শন গড়েছেন। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর ও 'Dead Men's Path'-এর মাইকেল অবি— দু'জনেই সাংস্কৃতিক মধ্যবর্তী অবস্থানে দাঁড়িয়ে। প্রথমজন অতীত আঁকড়ে ধরে বর্তমান হারান, দ্বিতীয়জন ভবিষ্যৎ নির্মাণে অতীত ধ্বংস করেন। কিন্তু ফল একই— পরিচয়ের ভাঙন। তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন—

> "আমি ইতিহাসের পণ্ডিত নই, আমি লেখক, প্রধানত সমসাময়িক কালের ... আমি চেয়েছি খণ্ড কালের মধ্যে সর্বকালের মানবজীবনের মৌল আবেগকে ধরে রাখতে।"[১৭]

এই উক্তি প্রমাণ করে, তাঁর সাহিত্য ঐতিহ্যের মৃত কাঠামো নয়, বরং সময় ও চেতনার অন্তর্বর্তী স্থান। যা এক 'Third Space' যেখানে অতীত ও বর্তমানের সংলাপ চলমান। অপরদিকে আচেবে বলেন—

> "আমরা যারা ইংরেজি ভাষা উত্তরাধিকার স্বরূপ পেয়েছি, আমরা এই উত্তরাধিকারকে ভালো বলতে পারছি না, কারণ এতে জাতিগত ঔদ্ধত্য ও বিদ্বেষ লুকিয়ে আছে। তবে মন্দের সঙ্গে ভালোটুকুও আমরা ফেলে দিতে চাই না।"[১৮]

এই বক্তব্যই তাঁর সাহিত্যচিন্তার সারকথা ঔপনিবেশিক ভাষাকে তিনি প্রতিরোধের হাতিয়ার বানিয়েছেন, ধ্বংসের নয়। উভয় লেখকই এক মধ্যবর্তী সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে লিখেছেন, যেখানে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা পরস্পরকে বাতিল না করে নতুন পরিচয়ের সন্ধান দেয়। দুই সাহিত্যিকের গল্পে যে দ্বন্দ্ব তা সামন্ততন্ত্র বনাম পুঁজিবাদ, ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা, উপনিবেশবাদ বনাম প্রতিরোধ, তা শেষপর্যন্ত এক মানবিক প্রশ্নে এসে মিলে যায় – মানুষ তার ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে কি টিকে থাকতে পারে? 'জলসাঘর'-এর নিভে যাওয়া বাতি ও 'Dead Men's Path'-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাগান উভয়ই উত্তর দেয় না। ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করলে সভ্যতার শিকড় কেঁপে ওঠে, আর ইতিহাসের সঙ্গে সংলাপ হারালে মানুষ নিজের পরিচয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হারায়। এই তত্ত্বের আলোকে বিশ্বম্ভরের জলসাঘর যেমন অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তী এক সাংস্কৃতিক স্থান, তেমনি মাইকেল অবির বিদ্যালয়ও সেই সাংস্কৃতিক 'Third Space' - যেখানে স্থানীয় বিশ্বাস ও পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ সংঘর্ষে লিপ্ত। এই দুই পরিসরেই পরিচয়ের সংকট জন্ম নেয়, এবং তা সমাজের বৃহত্তর দ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে ওঠে। উভয় গল্পে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সংঘাত শেষ পর্যন্ত মানবিক বিপর্যয়ে রূপ নেয়। একদিকে জলসাঘরের আলো নিভে যায়, অন্যদিকে স্কুলের বাগান ধ্বংস হয় উভয়ই প্রতীকী ইঙ্গিত; যখন সংস্কৃতি নিজের মূলে আঘাত করে, তখন সভ্যতার নির্মাণও ভেঙে পড়ে।

৩

তারশঙ্করের 'রায়বাড়ি' মূলত 'জলসাঘর'-এর ভাঙা দিকটি স্মরণ করিয়ে দেয়। রাবণেশ্বর রায়ের চরিত্রে জমিদার শাসনের নির্মমতা ও মানবতার দ্বন্দ্ব মিশ্রিত রয়েছে। তিনি প্রজাদের ওপর কঠোর শাসক হলেও বন্যার সময় তাদের রক্ষার জন্য দ্বার খুলতেন। এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে লেখক সামন্ত শোষণের জটিল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'রায়বাড়ি' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের প্রতাপ ও বিক্রমের চিত্র উঠে এসেছে। গল্পে উল্লেখ আছে— "গিন্নী, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।"[১৯] এই উক্তির মাধ্যমে বোঝা যায় রাবণেশ্বর কীভাবে নিজের প্রজাদের ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে ও তাঁর প্রতিপত্তি অটুট রাখেন। রাবণেশ্বরের চরিত্রে একটি বৈপরীত্য বিদ্যমান। তিনি গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাতে ভয় পান না, তবে বন্যার সময় প্রজাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া এবং গাঙ্গুলীর মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতেও পিছপা হন না। এই বৈপরীত্য তাঁকে দয়ালু স্বৈরশাসকের মতো রূপ দিয়েছে; একদিকে নিষ্ঠুর ও নির্মম, অন্যদিকে দয়ালু ও উদার। তাঁর চরিত্রে ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণ লক্ষণীয়। রাবণেশ্বরের চরিত্রে মানবতার দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে। জমিদারি টিকিয়ে রাখতে হলে কঠোর শাসন জরুরি, কিন্তু প্রজাদের প্রতি মানবিকতাও বজায় রাখতে হয়। তাই তিনি একদিকে কালী বাগদীর সাহায্যে প্রজাদের শোষণ ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নিপীড়ক সত্তার পরিচয় দেন, আবার অন্যদিকে বন্যার সময় আশ্রয় দিয়ে ও গাঙ্গুলীকে সাহায্য করে মানবিকতাও প্রকাশ করেন। লেখক এখানে নিপীড়ক জমিদারদের মাঝেও যে মানবতাবোধ বিরাজ করত, সেটি প্রকাশের প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক শোষণের প্রভাবে ইংরেজরা জমিদারদের বাধ্য করেছিল নিপীড়ক ভূমিকা পালন করতে।

> "১৭৯৩ সালে স্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের জমির মালিক বানিয়ে দেওয়া হলেও, নতুন জমিদারি ব্যবস্থায় অধিকাংশ জমিদারদের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত হয়।"[২০]

যদি জমিদার নির্ধারিত খাজনা সময়মতো দিতে না পারে, তবে তাদের সম্পত্তির কিছু অংশ নিলামে চলে যেতো। এই বন্দোবস্ত ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, পাশাপাশি পূর্বপুরুষদের জমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় জমিদারদের আয় হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলে জমিদাররা রায়তের ওপর খাজনার হার বাড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই কারণেই তৎকালীন জমিদারদের মধ্যে নিপীড়ক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়, যার নিদর্শন রাবণেশ্বর রায়ের চরিত্রে সুস্পষ্ট।

অতএব বলা যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রায়বাড়ি' গল্পে জমিদারি প্রথার বাস্তবসম্মত চিত্রায়ণ রয়েছে, যেখানে গল্পের অন্তরালে বিদ্রোহের একটি সুর প্রতীকায়িত। সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব তাঁর মানসলোকে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে, যা এই গল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

চিনুয়া আচেবের *গ্রামের একটি চার্চে* বা A Village Church গল্পটি ১৯৫১ সালে রচিত। এই গল্পে তিনি আফ্রিকার ইগবো সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টীয় ধর্ম ও তাদের নিজস্ব আদিবাসী সংস্কৃতির মধ্যকার সূক্ষ্ম মেলবন্ধন এবং দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। গল্পটি একধরনের হাস্যরসাত্মক স্কেচ বা ভঙ্গিমায় লেখা, যা পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম ও আদিবাসী আফ্রিকান সংস্কৃতির মধ্যে অসঙ্গতি এবং পার্থক্যগুলোকে নিপুণভাবে প্রকাশ করে। ইগবো সম্প্রদায় তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পাশাপাশি খ্রিস্টীয় ধর্মীয় রীতিনীতিগুলোকে নিজস্ব প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত করেছে। গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে বৃদ্ধ পাঠক বাইবেলের পৃষ্ঠা ঘেঁটে বলেন—

> "চিন্তা করো বাইবেলটি কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ... আমি যখন এই চিন্তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছলাম, বৃদ্ধ তখনও পাঠে ডুবে আছেন। কিছু বেপরোয়া প্রচেষ্টার পর তিনি বইটা বাজে কাজ হিসেবে খারিজ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> করলেন। কারণ বাইবেলটি প্রকাশকের হাত থেকে আসার পর খুবই সাধারণভাবেই পুনর্গঠিত হয়েছে। সেখানে বাইবেলের অংশগুলি, যেখানে সাধারণত প্রফেটদের কথা থাকা উচিত, সেখানে অস্বাভাবিকভাবে এসটি ম্যাথিউস গসপেলের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে।"[২১]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে আচেবে বাইবেলের অক্ষত বা একদম 'আদিম' রূপ না থাকার কথা ইঙ্গিত করেছেন। সাধারণত এই গল্পটিকে পশ্চিমা খ্রিস্টধর্ম ও আদিবাসী আফ্রিকান সংস্কৃতির মধ্যে ঐতিহ্যগত এবং আধুনিকতার দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখা হয়। আচেবে দেখিয়েছেন কীভাবে উপনিবেশবাদী পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধর্ম নিজেকে আফ্রিকার আদিবাসী জীবনযাত্রায় জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর সেই সঙ্গে আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তা গ্রহণ ও পরিবর্তন করে। গল্পের মাধ্যমে তিনি উপনিবেশবাদী ধর্ম প্রচারের মাঝে থাকা সাংস্কৃতিক সংঘাত ও হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন, যেখানে সংস্কৃতির প্রভাব ও অভিযোজনের সূক্ষ্ম দিকগুলো প্রকাশ পায়। উপনিবেশবাদ কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দখলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সাংস্কৃতিক ও মানসিক স্তরেও তার কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। আচেবের গল্পে বাইবেলের বিভ্রান্তিকর গঠন এবং পাঠকের অপারগতা সেই উপনিবেশিত মনোজগতেরই ইঙ্গিত দেয়, যেখানে নিজের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য হারিয়ে মানুষ এক বিকৃত সাংস্কৃতিক চেতনায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই গল্পটি তাই শুধু ধর্মের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপন নয়, বরং একটি গভীর প্রতিক্রিয়া বা ভিন্ন ডিসকোর্স, যা উপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাবে আত্মপরিচয়ের সংকট ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকে উদ্ভাসিত করে।

উক্ত দুটো গল্পে শ্রেণি ও ক্ষমতার পরিবর্তন এবং সামন্ততন্ত্র ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য লক্ষ করা যায়। তারাশঙ্করের গল্পে জমিদারতন্ত্রের পতন এবং নতুন বণিক শ্রেণির উত্থান যেমন এক সামাজিক রূপান্তরের চিত্র, তেমনি চিনুয়া আচেবের গল্পে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন আফ্রিকায় ইউরোপীয় আধিপত্যের প্রভাবে স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরও একধরনের শ্রেণি পরিবর্তন। 'রায়বাড়ি' গল্পে রাবণেশ্বর রায় প্রজাদের ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখতে চান, কিন্তু সেই প্রভুত্বের ভিত্তি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর জমিদারি কর্তৃত্ব যে নৈতিক বৈধতা হারিয়েছে, তা বোঝা যায় তাঁর মানবিক দ্বিধা ও নির্মমতার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। এই মনস্তাত্ত্বিক ভাঙনই আধুনিকতার সূচনা। অন্যদিকে, আচেবের গল্পগুলোতে শ্রেণি-সংঘাত নতুন রূপে দেখা দেয়, এখানে বর্ণবাদী শাসক ও উপনিবেশিত মানুষের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্যই প্রধান বাস্তবতা।

'A Village Church' গল্পে ইউরোপীয় খ্রিস্টধর্ম আফ্রিকার আদিবাসী সমাজে প্রবেশ করে ধর্মীয় শ্রেণি ও সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে। খ্রিস্টীয় বাইবেলের পুনর্গঠন বা ভুল পাঠের মধ্য দিয়ে আচেবে দেখান, কীভাবে উপনিবেশবাদ নিজস্ব সংস্কৃতিকে 'একমাত্র সত্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এটি অর্থনৈতিক পুঁজিবাদের মতোই মানসিক আধিপত্যের প্রতীক। তারাশঙ্করের সমাজে পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে, আর আচেবের সমাজে উপনিবেশবাদ তা সাংস্কৃতিক শ্রেণিতে রূপ দিয়েছে। উভয়ের ফল একই, নিম্নবর্গ ও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত, এবং ঐতিহ্য ক্ষয়প্রাপ্ত। তাই 'রায়বাড়ি'-এর প্রজারা যেমন নিপীড়িত অথচ সংস্কৃতির ধারক, তেমনি 'A Village Church'-এর সাধারণ গ্রামবাসীরাই তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখে। এইভাবে, দুই ভিন্ন সমাজে শ্রেণি ও আধিপত্যের রূপ আলাদা হলেও তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অভিন্ন— একটি ক্ষমতা অন্যটিকে ছাপিয়ে যায়, এবং সেই সংঘাতই সাহিত্যিক বয়ানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

৪

তারাশঙ্কর ও চিনুয়া আচেবের গল্পে আরেকটি বিষয় লক্ষ করা যায়, তা হল মনোজগতের উপনিবেশায়ন ও আত্মপরিচয়ের সংকট। উপনিবেশবাদ কেবল ভূখণ্ড দখল করে না; এটি মানুষের চিন্তা, ভাষা ও আত্মপরিচয়কেও নিয়ন্ত্রণ করে। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো যাকে বলেছেন— 'Colonization of the Mind', সেটিই আচেবের গল্পে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত। 'Dead Men's Path'-এর মাইকেল অবি পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাবে এমন এক মানসিক কাঠামোয় বেড়ে ওঠেন, যেখানে নিজের সংস্কৃতি অবমূল্যায়িত এবং ইউরোপীয় চিন্তা 'সত্য' বলে বিবেচিত। ফলে তাঁর 'আধুনিকতা' আসলে আত্ম-অস্বীকৃতিরই আরেক নাম।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমাদের স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য হল এসব বিশ্বাস সম্পূর্ণ নির্মূল করা... মৃত মানুষের পথের কোনো প্রয়োজন নেই।"[২১]

এই চিন্তাটিই মনোজগতের দখলদারিত্বের প্রতীক।

তারাশঙ্করের গল্পেও একধরনের মনোজগতের উপনিবেশায়ন লক্ষ করা যায়, যদিও তা ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে। 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পের খাজাঞ্চি পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী, কিন্তু নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাঁর মানবিকতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তিনি বুঝতে পারেন না, সততা ও নৈতিকতা আর 'অর্থনৈতিক দক্ষতা'-র সমার্থক নয়। খাজাঞ্চি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, "ভগবান আছেন"[২২] এটি শুধু আত্মসমর্পণ নয়; বরং এমন এক মানসিক বঞ্চনার প্রকাশ, যেখানে নতুন সমাজব্যবস্থা মানুষকে তার বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই চরিত্র আধুনিক সমাজে মনোজগতের দ্বিধা ও অপরাধবোধের প্রতীক।

দুই চরিত্র অবি ও খাজাঞ্চি, দুজনই এক প্রকার 'মনোজগতের সংকটে' ভোগেন। প্রথমজন নিজের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, দ্বিতীয়জন নতুন বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারেন না। উভয়ের জীবনেই একপ্রকার আত্মবিচ্ছিন্নতা (alienation) কাজ করে, যা আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদ উভয়ই মানুষের মনের ওপর একই প্রভাব ফেলে, দুটি ব্যবস্থাই ব্যক্তিকে তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আচেবের মাইকেল অবি যেমন নিজ সংস্কৃতির ভাষা ভুলে পশ্চিমা যুক্তিবাদে আশ্রয় নেয়, তারাশঙ্করের বিশ্বম্ভর বা খাজাঞ্চি তেমনি 'সময়' নামের নতুন প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

৫

তারাশঙ্করের 'মধুমাস্টার' এবং আচেবের 'Marriage is a Private Affair' দু'টি গল্পেই ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক অনুশাসনের সংঘাত প্রতিফলিত। 'মধুমাস্টার' গল্পেও নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় একজন আত্মভোলা, উদাসীন, আবেগপ্রবণ ও দেশপ্রেমী চরিত্র। তিনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ পোষণ করেন এবং বিদেশি নাগরিকদের ভারতবিরুদ্ধ কুৎসার প্রতিবাদে বই লেখেন। যদিও আর্থিক অনুদান ও উৎসাহে কাজ এগিয়ে যায়, শেষমেশ পুঁজিবাদী যুগের প্রতিনিধিত্বকারী সুরেন্দ্রনাথ মধুমাস্টারকে নিরুৎসাহিত ও অপমান করে। মৃত্যু পূর্বেই প্রকাশিত হয়নি বইটি, তবে মৃত্যুর পর তার খ্যাতি বেড়ে যায়। স্ত্রীও মৃত্যুর পর তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। এটি স্বদেশ প্রেমের সংগ্রামী শিক্ষকের জীবনের বর্ণনা, যেখানে তারাশঙ্কর নিরলস ও নিরাবেগভাবে দেশপ্রেম ও সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন।

> "বাবার বই বেরিয়েছে মা। বিলেতের কাগজে কাগজে তাঁর প্রশংসা।"[২৩]

অন্যদিকে, চিনুয়া আচেবে তাঁর ছোটগল্প 'Marriage is a Private Affair'-এ আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঐতিহ্যগত পারিবারিক প্রথার দ্বন্দ্বকে সংবেদনশীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র এননেমেইকা ও তার বাবা নেমেসকার সম্পর্কটি আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ও প্রজন্মগত উত্তরণের প্রতীক। গল্পের শুরুতেই এননেমেইকা ও নেনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। শহুরে ও আধুনিক চিন্তার নেনে পরামর্শ দেন, বাবাকে চিঠিতে খবর জানাতে; কিন্তু এননেমেইকা জানে তার রক্ষণশীল পিতা এমন সংবাদ সহজে নেবেন না। এখান থেকেই সংঘাতের সূত্রপাত— এক প্রজন্ম ভালোবাসা ও স্বাধীনতাকে, অন্য প্রজন্ম ঐতিহ্য ও ধর্মকে বিয়ের কেন্দ্রে রাখে।

নেমেসকা ইতোমধ্যে তার ছেলের জন্য ইবো মেয়ে উগোয়ের কথা ভেবে রেখেছেন। তার কাছে বিয়ে মানে পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিধান টিকিয়ে রাখা; ভালোবাসা সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। এননেমেইকা যখন বলে, সে উগোয়েকে ভালোবাসে না ও ইবো-বহির্ভূত নেনেকে বিয়ে করতে চায়, তখন নেমেসকা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—

> "কেউ বলেনি তুমি বাসতে। কেনইবা বাসা উচিত?"[২৪]

এই উক্তি রীতিনির্ভর সমাজের কণ্ঠস্বর।

নেনে শিক্ষিতা, আধুনিক ও খ্রিস্টান নারী; এই পরিচয় নেমেসকার চোখে অপরাধ। ধর্মীয় উদ্ধৃতি টেনে তিনি নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ছেলের সিদ্ধান্তকে 'শয়তানের কাজ' বলে প্রত্যাখ্যান করেন। আট

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বছর ধরে তিনি ছেলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে বিয়ের ছবি পর্যন্ত ফেরত পাঠান, এমনকি যেখানে নেনেকে বাদ দেওয়া হয়। পিতৃস্নেহও তাঁর সংকীর্ণ মানসিকতার কাছে পরাজিত হয়।

অবশেষে নেনের চিঠিতে নাতিদের কথা ও দেখা করার আকুতি নেমেসকার হৃদয়কে নরম করে। এক ঝড়ো রাতে একাকিত্বে তিনি বুঝতে পারেন, হয়তো নাতিদের না দেখেই মারা যাবেন। সেই অনুতাপ তাঁর অটল বিশ্বাসকে নাড়া দেয়। গল্পের শিরোনাম 'Marriage is a Private Affair' হলেও আচেবে আসলে এর যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। আফ্রিকান সমাজে বিয়ে কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটি পরিবার, ধর্ম ও সংস্কৃতির সামাজিক চুক্তি। এভাবেই আচেবে নেমেসকা ও এননেমেইকার মাধ্যমে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্যগত সংস্কারের দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন। আচেবের গল্পে এননেমেইকা ও নেনের ভালোবাসা কেবল রোমান্টিক নয়; এটি সামাজিক কাঠামো ও পারিবারিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক প্রতীকী প্রতিবাদ। নেমেসকা পিতৃপ্রতিনিধিত্ব করছেন ঐতিহ্য, ধর্মীয় শৃঙ্খলা ও সামাজিক সম্মিলনের, আর এননেমেইকা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক। এই দ্বন্দ্বের ফল যে কেবল পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা নয়, তা নয়, এটি আফ্রিকার সমাজে পরিবর্তনের এক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে, তারাশঙ্করের 'মধুমাস্টার'-এ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক হলেও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। তাঁর বই প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর, অর্থাৎ তাঁর আদর্শ সমাজের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আচেবের নেনেমেইকা যেমন পরিবারের বাইরে গিয়ে ভালোবাসা বেছে নেয়, মধুসূদন তেমনি সমাজের প্রচলিত অর্থনীতির বাইরে গিয়ে আদর্শকে বেছে নেয়। দুই গল্পেই ব্যক্তি বনাম সমাজের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় সামাজিক বাস্তবতার কাছে। এখানেই আচেবে ও তারাশঙ্করের শিল্পচেতনা মিলিত হয়; উভয়েই দেখিয়েছেন, আধুনিকতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু সেই স্বাধীনতা সামাজিক বন্ধনের ভেতরে টিকে থাকতে পারে না। দুই সাহিত্যিকের গল্পই শেষ পর্যন্ত একটি মধ্যবর্তী সাংস্কৃতিক অঞ্চলে অবস্থান করে, যেখানে পুরাতন ও নতুন, উপনিবেশিত ও আধুনিক, স্থানীয় ও বিশ্বজনীন সব পরিচয়ই পুনর্নির্মিত হয়।

৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনুয়া আচেবে, দু'জনই তাঁদের নিজ নিজ সাংস্কৃতিক পরিসরে সমাজের রূপান্তর ও মানবিক সংকটের ইতিহাস লিখেছেন। একজন উপনিবেশ-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী, অন্যজন আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দমন ও সাংস্কৃতিক জাগরণের দলিল রচয়িতা। কিন্তু সময়, ভৌগোলিক অবস্থান ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্যভাবে সমান্তরাল। তাঁদের রচনায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, শ্রেণি ও ক্ষমতার পরিবর্তন, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং সাংস্কৃতিক মধ্যবর্তীতা, সবই এক মানবিক ন্যারেটিভে মিশে গেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের সাহিত্য একধরনের 'Comparative humanism' - যেখানে ব্যক্তি, সমাজ ও ইতিহাস একে অপরের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।

তারাশঙ্কর ও আচেবে উভয়েই ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসারী নন, আবার আধুনিকতার অন্ধ প্রবক্তাও নন। তাঁরা বুঝেছিলেন, সভ্যতার বিকাশ মানেই পুরনোকে ধ্বংস করা নয়, বরং তাকে নতুন প্রেক্ষাপটে পুনঃপাঠ করা। তারাশঙ্কর বলেছেন—

> "ঐতিহ্যের মর্মকথা মৃত নয়, তা জীবিত মানুষের রক্তে প্রবাহিত।"[২৫]

অন্যদিকে আচেবে বলেন—

> "A people's culture is their collective memory. To lose it is to lose themselves."[২৬]

এই দুই উক্তির মধ্যেই নিহিত তাঁদের সাহিত্যদর্শনের মিল। ঐতিহ্য তাঁদের কাছে অনড় নিদর্শন নয়, বরং এক পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা, যা সময়ের সঙ্গে নতুন অর্থে জন্ম নেয়। 'জলসাঘর'-এর নিভে যাওয়া প্রদীপ কিংবা 'Dead Men's Path'-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত পথ— উভয়ই সেই ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্নতার প্রতীক যা মানুষকে ইতিহাস থেকে নির্বাসিত করে। এই প্রতীকের মাধ্যমে দুই সাহিত্যিক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন - 'Modernization' যদি ইতিহাসবিহীন হয়, তবে তা অগ্রগতি নয়,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আত্মবিস্মৃতি। যদিও তারাশঙ্করের সমাজ ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন, তাঁর গল্পে উপনিবেশের সরাসরি প্রভাব অপেক্ষা পুঁজিবাদের রূপান্তরিত অভিঘাত বেশি প্রকট। অন্যদিকে আচেবে ঔপনিবেশিক আফ্রিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু উভয়ের গল্পে ক্ষমতা, শ্রেণি ও শোষণের কাঠামো প্রায় অভিন্ন। নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গোর ভাষায়—

> "Both capitalism and colonialism destroy culture, for both are founded upon exploitation."[২৭]

এই তত্ত্বের আলোকে দেখা যায়, তারাশঙ্করের পুঁজিবাদী বাস্তবতা ও আচেবের উপনিবেশিক বাস্তবতা— দুটিই মানুষের সংস্কৃতিকে পণ্যে রূপান্তর করেছে। জমিদারতন্ত্র ও খ্রিস্টীয় মিশনারি প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে এক 'প্রভু-দাস' সম্পর্ক তৈরি করেছে, যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে।

তারাশঙ্করের গল্পে এই সম্পর্ক অর্থনৈতিক, আচেবের গল্পে সাংস্কৃতিক; কিন্তু উভয়ের মূলে রয়েছে আধিপত্য ও আত্মবিচ্ছিন্নতা। আচেবে তাঁর প্রবন্ধ 'The African Writer and the English Language'-এ স্পষ্টভাবে বলেন—

> "English is not a symbol of slavery, but a tool to tell our story to the world."[২৮]

এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে একধরনের সাংস্কৃতিক বাস্তববাদী (cultural pragmatist) করে তোলে। তিনি জানতেন, ভাষা ঔপনিবেশিক হলেও, তার ব্যবহার প্রতিরোধের হাতিয়ার হতে পারে। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। তিনি উপনিবেশবিরোধী সরাসরি রাজনীতি করেননি, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক মানবতাবাদ উপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক প্রকার নীরব প্রতিবাদ। 'খাজাঞ্চিবাবু' বা 'গণদেবতা'–তে দেখা যায়, কিভাবে অর্থনীতি মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে আত্মসচেতনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অ্যান্থনি গিডেন্স বলেছেন,

> "Modernity tears space away from place, creating a disembedded social order."[২৯]

তারাশঙ্কর ও আচেবে উভয়ের চরিত্রই এই 'disembedded' অবস্থার প্রতীক— তারা আর সমাজের মূলে সংযুক্ত নয়, বরং সময় ও সভ্যতার প্রান্তে নির্বাসিত। হোমি কে. ভাভার 'Third Space' তত্ত্ব অনুসারে, উপনিবেশোত্তর সমাজে পরিচয় কোনো স্থির কাঠামো নয়, বরং ক্রমাগত আলোচনার ফল।[৩১] তারাশঙ্করের বিশ্বম্ভর বা আচেবের মাইকেল অবি— দু'জনই এই মধ্যবর্তী অবস্থানের প্রতিনিধি। তাঁরা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী এক সঙ্কর জায়গায় অবস্থান করছেন, যেখানে দ্বন্দ্বই জীবনের সত্য। এই অবস্থান কোনো ব্যর্থতা নয়; বরং এখানেই নতুন মানবিক চেতনার জন্ম। ভাভা যেমন বলেন -

> "Hybridity is the sign of the productivity of colonial power, its shifting forces and fixities."[৩০]

বিশ্বম্ভরের পতন ও অবির পরাজয় আসলে এক নতুন সমাজবোধের সূচনা; যেখানে সংস্কৃতি আর একরৈখিক নয়, বরং বহুমাত্রিক। তারাশঙ্কর ও আচেবে উভয়েই সাহিত্যকে কেবল গল্প বলার মাধ্যম নয়, বরং সমাজচেতনার পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের রচনায় ব্যক্তির গল্প সমাজের ইতিহাসে রূপ নেয়, এবং সমাজের ইতিহাস ব্যক্তির অন্তর্জগতে প্রতিফলিত হয়। তারাশঙ্করের সাহিত্য মানুষকে তার সময়ের সঙ্গে সংলাপ শেখায়—

> "জীবনের প্রতিটি রূপান্তরই এক নতুন সৃষ্টি।"[৩১]

আচেবে একই সুরে বলেন—

> "The writer's duty is to restore the dignity of his people by telling their stories."[৩২]

দুজনেই সাহিত্যকে প্রতিরোধের এক নীরব অস্ত্র হিসেবে দেখেছেন; একজন সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যজন সাংস্কৃতিক দমননীতির বিরুদ্ধে।

৭

অতএব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিনুয়া আচেবে; দু'জনই তাঁদের সাহিত্যিক যাত্রায় মানবসভ্যতার দুই প্রান্তকে একসূত্রে বেঁধেছেন। একদিকে বাংলার রাঢ়ভূমি, অন্যদিকে নাইজেরিয়ার ইবো ভূমি; দু'টি ভূগোল ভিন্ন, কিন্তু তাদের সুর এক – মানুষ, তার ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম। উভয় লেখকই তাদের প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সাহিত্যটিকে ব্যক্তিগত ও ঐতিহ্যগত চেতনার সংঘাতের মণিময়ে রূপ দিয়েছেন। এতে শুধুমাত্র স্থান বিশেষের বৈশিষ্ট্য নয়- বরং উভয়ে সৃষ্ট সমকালীন মানবজীবনের সার্বজনীন প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও পরিচয়ের সংকটে আলোকপাত করেছেন। আধুনিকতার চাপ, ঐতিহ্যের টান, উপনিবেশিক মোড়ল আচরণ ও মানসিক আনুগত্য; এগুলোকে শিল্পের পরিসরে মূর্ত করে তাদের সাহিত্য বিশ্বজোড়া মানবিক অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। ফলে, আচেবে ও তারাশঙ্কর - দু'জনই তাঁদের সাহিত্যকর্মে যে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন তুলে ধরেছেন, তা কেবল তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি নয়, বরং বিশ্বজনীন মানবঅভিজ্ঞতার প্রতিফলন। আধুনিকতা ও ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও প্রতিরোধ, কেন্দ্র ও প্রান্তের সংঘাত; এই সকল বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তাঁদের ছোটগল্পগুলো হয়ে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরূপ। ভিন্ন দেশ, সমাজ ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায় দাঁড়িয়েও দুই সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে এমন দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য সত্যিই এক বিস্ময়। ফলে তাঁদের সাহিত্য একরকম উপনিবেশোত্তর মানবতাবাদ (Postcolonial Humanism) যা মানুষকে শেখায়, 'নিজের গল্প নিজে বলা'-ই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৩৫৮), *আমার কালের কথা,* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, পৃ. ১২
২. চিনুয়া, আচেবে, (২০১৬), 'আচেবের লেখার প্রসঙ্গসূত্র' (অনুবাদ : নাজনীন সুলতানা), *ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে : পাঠ ও বীক্ষণ*, (সম্পাদনা : মুহম্মদ মুহসিন), কবি প্রকাশনী, ঢাকা-১২০৫, পৃ. ৭৬-৭৭
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৩৮৭), 'তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা', *আমার কালের কথা,* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪১৭
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৩৪৪), *জলসাঘর,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা - ১৩৯৩, পৃ. ১৯
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৯. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, (১৯৯৪), 'জলসাঘর : নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব', *যুগলবন্দী গল্পকার : তারাশঙ্কর মানিক*, সম্পাদনা : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৫
১০. চিনুয়া, আচেবে, (২০১৯), *চিনুয়া আচেবে : নির্বাচিত ছোটোগল্প* (অনুবাদ : মোহাম্মদ হারুণ অর রশীদ), একুশে বইমেলা, ঢাকা, পৃ. ১৫
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
১৬. H. K. Bhabha, (1994), *The Location of Culture.* London & New York: Routledge. P. 37
১৭. বিশ্বাস, ড. মিল্টন, (২০১৬), *জলসাঘর* (ভূমিকাংশ), সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১০৪
১৮. চিনুয়া, আচেবে, (২০১৬), 'আফ্রিকান লেখক ও ইংরেজি ভাষা' (অনুবাদ: আনোয়ার পারভেজ), *ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবে: পাঠ ও বীক্ষণ*, (সম্পাদনা : মুহম্মদ মুহসিন), কবি প্রকাশনী, ঢাকা-১২০৫, পৃ. ৪৫-৪৬
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৩৪৪), *জলসাঘর,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-১৩৯৩, পৃ. ৯
২০. উইকিপিডিয়া, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, https://bn.wikipedia.org/s/1r9l

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 151 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২১. চিনুয়া, আচেবে, (২০১৯), *চিনুয়া আচেবে : নির্বাচিত ছোটোগল্প* (অনুবাদ : মোহাম্মদ হারুণ অর রশীদ), একুশে বইমেলা, ঢাকা, পৃ. ২৮

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৩৪৪), *জলসাঘর,* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-১৩৯৩, পৃ. ৪১

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

২৪. চিনুয়া, আচেবে, (২০১৯) *চিনুয়া আচেবে : নির্বাচিত ছোটোগল্প* (অনুবাদ : মোহাম্মদ হারুণ অর রশীদ), একুশে বইমেলা, ঢাকা, পৃ. ৫৮

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৫৮), *আত্মকথা: আমার সাহিত্যজীবন।* কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, পৃ. ১২৫

২৬. C. Achebe (1988). *Hopes and Impediments: Selected Essays.* New York: Doubleday, P. 58

২৭. N. wa. Thiong'o (1986). *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature.* Nairobi: East African Educational Publishers. P. 12

২৮. C. Achebe (1975). *The African Writer and the English Language.* In *Morning Yet on Creation Day.* London: Heinemann. P. 10

২৯. Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity.* Stanford: Stanford University Press. P. 22

৩০. Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture.* London & New York: Routledge. P. 112

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, (১৯৬২), *গণদেবতা,* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৭৯

৩২. C. Achebe (1973). *The Writer and His Community.* In *Morning Yet on Creation Day.* London: Heinemann. P. 14